খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার
সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ২৪শে জুলাই, ২০১৫
তারিখে বায়তুল ফুতুহ্ লণ্ডন এ প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আদেশ পালন করা মোমিন গণের কর্তব্য । নিজেদের ব্যাখ্যা না করে যদি তা আক্ষরিকভাবে মেনে চলা হয় তাহলে ঈমান নষ্ট হয় না ।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এখন আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু ঘটনা শোনাব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

তাযকেরায় ১৯০৮ইং সনের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের অধীনে একটি ইলহাম লেখা আছে। এই দিনে আটটি ইলহামের উল্লেখ রয়েছে যার একটি হলো, 'লা তাক্বতুলু যায়নাব' অর্থাৎ যায়নাবকে হত্যা করো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় কিছু ঘটনার অধীনে এই ইলহামের ব্যাখ্যা এই ভাবে করেছেন যে, ১৯০৮ সালের প্রথম দিকে হাফেজ আহমদুল্লাহ্ খান সাহেব মরহুমের দুই কন্যার বিয়ের প্রস্তাব আসে যাদের মাঝে বড় জনের নাম হল যায়নাব। ছোট জনের নাম ছিল কুলসুম। আরও অনেকেরই যায়নাবের সাথে সম্পর্কের বাসনা ছিল। শেখ আব্দুর রহমান মিস্রীর পক্ষ থেকেও একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মিস্রী সাহেবের সাথে তার বিয়ে দেয়া অপছন্দ করলেন যে, মিস্রী সাহেবের সাথে যেন তার বিয়ে না হয় কিন্তু সাধারণত কোন বিষয়ে তিনি যেভাবে জোর দিতেন সেভাবে জোর দেননি বা বেশি চাপাচাপি করেন নি। সেই দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়, 'লা তাক্বতুলু যায়নাব' অর্থাৎ যায়নাবকে ধ্বংস করো না। হাফেয আহমদুল্লাহ্ মরহুম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কোন না কোন কারণে পছন্দ করেন নি আর ভেবেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরামর্শ সঠিক নয়। দ্বিতীয় জায়গায় বিয়ে না দিয়ে মিস্রী সাহেবের কাছে বিয়ে দেয়া উচিত। আর ভেবেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে ইলহাম রদ করেছে বা প্রত্যাখ্যান করেছে। অর্থাৎ 'লা তাক্বতুলু যায়নাব' সংক্রান্ত ইলহামের অর্থ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরামর্শ আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ হয় নি, বরং দ্বিতীয় যে প্রস্তাব বা এর বিরোধী যে প্রস্তাব ছিল তা সঠিক ছিল। যাহোক, তিনি মিস্রী সাহেবের কাছে মেয়ে বিয়ে দেন। আর এই তারিখ এভাবে সংরক্ষিত থাকে, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলছেন যে, মিস্রী সাহেবের নিকাহ্ বা বিয়ে আরো দুই বিয়ের সাথে সেই দিন হয়েছে যেই দিন আমাদের বোন মোবারেকা বেগমেরও বিয়ে হয়েছিল, আর এটি ১৭ই ফেব্রুয়ারী ছিল। অথচ এই ইলহামের পিছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য ছিলো, এই ব্যক্তি থেকে এক ভারি ফিৎনা উৎসারিত হবে যেমনটা পরবর্তীতে মিস্রী সাহেব থেকে এক নৈরাজ্যের সূচনা হয়। এই কথার প্রমাণও আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেবকে এই পরমর্শই দিয়েছেন। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, মিস্রী সাহেব যখন জামাত ছেড়ে দিয়েছেন তখন পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব আমাকে একটি পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, আমার সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেবকে বলেছিলেন যে, শেখ আব্দুর রহমানের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া সমীচিন হবে না কিন্তু হাফেয সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা মানেন নি। আর এখানে মেয়ে বিয়ে দেন তখন আমার মারাত্মক রাগ ধরে এবং পীর মঞ্জুর সাহেব এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হই আর বলি যে, হুযূর! আপনি খোদা তা'লার মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো যখন মা'মুর

একটি কথা বলেন তখন সব মু'মিনদের উচিত সেটি মেনে চলা কিন্তু হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেব হুযূরের অবাধ্য হয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন বলেন, আপনি সঠিক বলেছেন কিন্তু এমন বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমারও মনে আছে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র যুগে শেখ মিস্‌রী সাহেব বাজারে নিজ শ্বশুরকে প্রহার করে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মিস্‌রী সাহেবের প্রতি মারাত্মক অসন্তুষ্ট হন। আমি বেশ কয়েকদিন তার কাছে আকুতি মিনতি করে তাকে ক্ষমা করাই। সুতরাং এই ইলহামের অর্থ হলো তুমি শেখ মিস্‌রীর কাছে যায়নাবকে বিয়ে দেবে না নতুবা তার ঈমানও নষ্ট হবে। অতএব পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, এই বিয়ের ফলে তার ঈমানও ধ্বংস হয়েছে। জামাতে মিস্‌রী সাহেবের মর্যাদার কথা এটি থেকে ধারণা করুন যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আফ্রিকা থেকে এক বন্ধু আমাকে পত্র লিখেছেন যে, মিস্‌রী সাহেবের জামাত ছেড়ে দেয়া নিয়ে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তিনি লিখেন, এত বড় বড় মানুষের ঈমান যেখানে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে আমাদের ঈমানের গুরুত্বই বা কি? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তাকে লিখেছি যে, কে বড় এই সিদ্ধান্ত করা আল্লাহ্ তা'লার কাজ আপনার নয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে তাকে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন যাকে আপনি বড় মনে করতেন আর আপনাকে জামাতে রেখেছেন অতএব প্রমাণিত হলো সে নয় বরং আপনি বড়। যাহোক মিস্‌রী সাহেব যতদিন জামাতভুক্ত ছিলেন তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। আজ আমরা দেখছি যে, তিনি অর্থহীন। সুতরাং মা'মুরের কথা মেনে চলা মু'মিনদের জন্য আবশ্যক আর তা বোঝা উচিত। নিজেদের ব্যাখ্যা না করে আক্ষরিকভাবে যদি তা মেনে চলা হয় তাহলে ঈমান নষ্ট হয় না বা ধ্বংস হয় না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবের স্বভাব ছিল বড় ত্বরাপরায়ণ। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভ্রমণের জন্য বাসারাওয়ার দিকে যান। পথিমধ্যে তিনি ভ্রমণকালে বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কালাম বা কথা এবং বান্দার কালাম বা কথার মাঝে অনেক পার্থক্য থেকে থাকে। তিনি (আ.) তাঁর একটি ইলহাম শুনান এবং বলেন যে, দেখ এটিও একটি ইলহাম। পক্ষান্তরে হারীরির উক্তিও রয়েছে, হারীরি অনেক বড় এক লেখক ছিল। মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব কথার শেষ অংশ মনোযোগ সহকারে শুনেননি আর ইলহাম সম্পর্কে ধরে নেন যে, এটি হারীরির উক্তি। তিনি বলেন একেবারেই বাজে কথা এটি। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বলেন যে, এটি তো খোদা তা'লার ইলহাম বা উক্তি তখনতাৎক্ষনিকভাবে মৌলভী সাহেব বলেন যে, সুবহানাল্লাহ্ কত উন্নত মানের উক্তি। সুতরাং কোন কথা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তড়িঘড়ি বা তাড়াহুড়া করে কিছু বলা উচিত নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁর দাবীর পর সে বলে যে, আমি এই ব্যক্তিকে উপরে উঠিয়েছি এখন আমিই তাঁকে নিচে নামাব। কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা তার নামকে মিটিয়ে দিয়েছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে সারা পৃথিবীতে সমুন্নত করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী সাহেবের এক পুত্র আর্য ধর্ম গ্রহণ করে বা আরিয়া হয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি তাকে কাদিয়ান ডেকেছি এবং পুনরায় তাকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে এনেছি। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব এ কারণে আমাকে কৃতজ্ঞতা মূলক পত্রও লিখেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) দ্বিতীয় খিলাফতের যুগে আভ্যন্তরীন এবং বাহিরের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে বিরোধিতা চলে আসছে কিন্তু তাসত্ত্বেও

জামাত ক্রমাগতভাবে উন্নতি করছে। হুযূর বলছেন যে, বরং আজও আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র এবং বিরোধিতার ধারা অব্যাহত আছে কিন্তু খোদার অপার কৃপায় জামাত উন্নতি করে চলেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামাত কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বর্তমান মর্যাদায় উপনীত হয়েছে। আর এটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, খোদার ফযল বা কৃপা সবসময় জামাতের সাথে ছিল। কিন্তু এই কৃপারাজিকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য জামাতের সবসময় দোয়ায় রত থাকা উচিত। যদি সত্যিকার অর্থে আমরা দোয়া করতে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল বিরোধিতার অপমৃত্যু ঘটবে।

একবার হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-র অতুলনীয় ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফা আউয়াল (রা.)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এক উন্নত চাকুরির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেই চাকুরি শেষ হতেই তিনি পৈত্রিক অঞ্চলে ডাক্তারি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। সেখানে তার অনেক খ্যাতি ছিল। তার পৈত্রিক এলাকা হলো সারগোদার ভেরা। এখানে অনেক বড় বড় জমিদার রয়েছে যাদের বেশীর ভাগ ছিল তাঁর ভক্ত। সেখানে তার ব্যবসার সফলতার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আসেন। কয়েকদিন পর যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছ হয় তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, এই বস্তু জগতের আপনি অনেক কিছু দেখেছেন, এখন এখানেই বসতি স্থাপন করুন। তিনি এই নির্দেশ শিরোধার্য করেন আরএমনভাবে শিরোধার্য করেন যে, পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম নেয়ার জন্যও নিজে যাননি বরং দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তা আনিয়ে নেন। সেই যুগে এখানে তার প্র্যাকটিস সফল হওয়ার কোন আশাই ছিল না বরং এখানে এক পয়সা দেয়ার মতো সামর্থবানও কেউ ছিল না কিন্তু তিনি কোন কথার ভ্রুক্ষেপ করেননি। তারপরও তার খ্যাতি এমন ছিল যে, বাহির থেকে রোগীরা তার কাছে পৌঁছে যেতআর এইভাবে আয় উপার্জনের কোন না কোন পথ খুলে যেত। কিন্তু হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের কুরবানী এমন পর্যায়ের ছিল যে, আয় উপার্জনেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না, কোন দিক থেকে ফিস আসারও কোন সম্ভাবনা ছিল না, কোন বেতনও ছিল না, আর বৃত্তিও না। কোন দিক থেকেই আয়ের কোন উৎস ছিল না। কিন্তু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতেন। এখন সকল বিভাগ অর্থাৎজামাতী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে যত কাজ করছে এই সব কাজ তিনি একা করতেনঅথচ তাঁর জীবন জীবিকারও কোন উপায় ছিল না। আর এটিও তৃণলতাহীন প্রান্তরে জীবন উৎস্বর্গ করার মতোই ব্যাপার ছিল। তোএই হলো আমাদের প্রবীণদের আদর্শ যা আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগীদেরকে বিভিন্ন সময় সামনে রেখে নিজের অবস্থা সম্পর্কে ভাবা উচিত।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মৌলভী আব্দুল করীম (রা.)-এর যেই ভালোবাসা ছিল, প্রেম ছিল সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের বিশেষ প্রেম এবং ভালোবাসা ছিল। এমন ভালোবাসা ছিল যে, এটি কেবল তারা বুঝতে পারে যারা সেই যুগ দেখেছে। অন্যরা তা ধারণাও করতে পারবে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি এমন এক সময় ইন্তেকাল করেন যখন আমার বয়স ছিল ষোল বা সতেরো। আর যে যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য তার ভালোবাসা আমি বুঝতে পেরেছি তখন আমার বয়স হবে বারো বা তেরো বছর। অর্থাৎ অনেকটা শৈশব ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও এটি আমার হৃদয়ে এমনভাবে গ্রথিত রয়েছে যে, মৌলভী সাহেবের দু'টো জিনিস আমি কখনও ভুলতে পারবো না। একটি হলো তার পানি পান করা আর অপরটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার ভালোবাসা। তিনি ঠান্ডা পানি খুবই পছন্দ করতেন আর সাগ্রহে তা

পান করতেন। পান করার সময় তার গলা থেকে এমন শব্দ বের হতো যেন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতকে একত্রিত করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কয়েক ঢোক পান করার পর বলতেন আলহামদুলিল্লাহ্, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই যুগে এই মসজিদে আক্বসার কূপের পানির বড় খ্যাতি ছিল। এখন জানা নেই যে, মানুষ কেন এর কথা ভুলে গেছে। তার রীতি ছিল, তিনি বলতেন যে, ভাই কেউ পুণ্যার্জন করো আর পানি নিয়ে আস। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বৈঠকে নিজে উপস্থিত থাকতেন তখনকার কথা ভিন্ন ছিল নতুবা তিনি সিড়িতে এসে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন আর যে পানি নিয়ে আসত তার কাছ থেকে গ্লাস নিয়ে পান করা আমন্ত করতেন। দ্বিতীয় কথা হলো তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে যখন বসে থাকতেন তখন এমন মনে হতো যে, তার চোখ হুযূরের পবিত্র দেহ থেকে কিছু নিয়ে ভক্ষন করছে বা খাচ্ছে। তখন তাঁর পবিত্র চেহারায় হাস্যোৎফুল্লতা এবং প্রস্ফুটিত ফুলের এক বাগান তরঙ্গিত মনে হতো। তাঁর চেহারার প্রতিটি বিন্দুতে আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। তিনি যেভাবে হাসিমুখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনতেন আর যেভাবে পার্শ্ব পরিবর্তন করে করে সাধুবাদ জানাতেন তা এক দর্শনীয় দৃশ্যের অবতারনা করত। এর নূন্যতম চিত্র যদি আমি অন্য কারও মাঝে দেখে থাকি তাহলে তা ছিল হযরত হাফেয রওশন আলী মরহুমের মাঝে। এক কথায় মৌলভী আব্দুল করীম মরহুমের হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ প্রেম এবং ভালোবাসা ছিল। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও তার প্রতি একই ধরণের ভালোবাসা ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এই ছিলযে, তিনি সবসময় মাগরিবের নামাযের পর বসে আলাপচারিতায় রত হতেন। কিন্তু মৌলভী সাহেবের তিরোধানের পর তিনি এমনটি করা বন্ধ করে দেন। কেউ নিবেদন করে যে, হুযূর! আপনি এখন আর বসেন না। তিনি (আ.) বলেন, মৌলভী আব্দুল করীমের জায়গা খালি দেখে আমার কষ্ট হয়। অথচ কে আছে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেয়ে বেশী আল্লাহ্ তা'লাকে হাই এবং পুনর্জীবনদাতা হিসেবে বিশ্বাস করত। তাই এটি এক তরফা ভালোবাসা ছিল না তিনি (আ.) তার সাহাবীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অপর একজন সাহাবী হযরত মুনসী আড়োরা খান সাহেবের তাঁর (আ.) প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মুনসী আড়োরা খান সাহেব মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। তিনি কপুরথলায় থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কপুরথলার জামাতের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার এত ভূয়সী প্রশংসা করতেন যে, তিনি তাদেরকে এক লিখিত সন্তুষ্টি নামায়ও ধন্য করেছেন যা তারা অর্থাৎ জামাত সংরক্ষিত রেখেছে। তিনি (আ.) লিখেন, এই জামাত এমন আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে যে, জান্নাতে তারা আমার সাথী হবে। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বারবার অনুরোধ করে যে, হুযূর! কোন সময় কপুরথলা তশরীফ নিয়ে আসেন বা আগমন করুন। তিনি (আ.)ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সুযোগ পেলে আসব। একবার সুযোগ আসলে তাদেরকে পূর্ব সংবাদ দেয়ার মতো সময় ছিলো না তাই কোন সংবাদ না জানিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যাত্রা করেন আর কপুরথলা স্টেশনে যখন নামেন তখন এক ভয়াবহ বিরোধীর তাঁর (আ.) ওপর চোখ পড়ে যে তাঁকে চিনত। যদিও সে বিরোধী ছিল কিন্তু মহান লোকদের একটা গভীর প্রভাব থেকে থাকে। মুনসী আড়োরা খান সাহেব বলেন যে, আমরা কোন একটা দোকানে বসে কথা বলছিলাম। সে ছুটে আসে আর বলে যে, তোমাদের মির্যা সাহেব এসেছেন। এ কথা শুনে জুতা এবং পাগড়ী সেখানেই পড়ে থাকে আর আমি খালি পায়ে এবং খালি মাথায় স্টেশনের দিকে ছুটি। কিছুদূর গিয়ে আমার মনে হলো যে, আমাদের কোথায় এমন সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে আসবেন। সংবাদদাতা বিরোধী, সে কৌতুক তামাশা করে থাকবে। তখন আমি দাঁড়িয়ে তাকে বকাঝকা আরম্ভ করি। মুনসী সাহেব বলেন, আমি তাকে বকাঝকা করি

যে, তুমি মিথ্যা বলছ, ঠাট্টা করছ। কিন্তু এরপর আবার ভাবলাম যে, হয়তো এসেই গিয়ে থাকবেন। আমি আবার ছুটতে আরম্ভ করি। এরপর আবার ভাবলাম যে, এত সৌভাগ্য আমাদের হবে না এবং পুনরায় তাকে বকাঝকা আরম্ভ করি। সে বলে যে, আমাকে বকাঝকা করো না, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি। সে আমার সাথে যাত্রা করে। এক কথায় আমি একবার দৌড়ালে আর একবার দাঁড়িয়ে যেতাম। এইভাবে যাচ্ছিলাম হঠাৎ সামনে দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শুভাগমন হচ্ছে। তো এটি হলো উন্মাদের ভালোবাসা আর তার প্রেমাস্পদ হওয়ার কথা মনে পড়লেই হৃদয় বলতো যে, তিনি কিভাবে আমাদের কাছে আসতে পারেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের স্বল্পকাল পর মুনসী আড়োরা খান সাহেব কাদিয়ান এসে যান। একবার তিনি আমাকে সংবাদ পাঠান যে, আমি দেখা করতে চাই। আমি যখন তার সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে আসলাম দেখলাম যে, তার হাতে দু'টি বা তিনটি আশরাফী রয়েছে যা আমার হাতে তুলে দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, হযরত আম্মাজানকে দেবেন। আমার মনে নেই যে, তখন তিনি কি বলতেন কিন্তু আম্মাজান বা আম্মাজী অর্থাৎ মা অর্থবোধক কোন শব্দ তিনি বলেন। এরপর তিনি অঝরে কান্না আরম্ভ করেন আর উচ্চ স্বরে এমনভাবে কাঁদতে থাকেন যে, তার পুরো শরীর কাঁপছিল। যদিও আমার ধারণা ছিল যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্মৃতি তাকে কাঁদাচ্ছিল কিন্তু তিনি এতটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁদছিলেন যে, আমার মনে হলো, অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। এক কথায় অনেকক্ষন বরং প্রায় আধা ঘন্টা ধরে তিনি কাঁদতে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করতে থাকি যে, ব্যাপার কি? তিনি উত্তর দিতে চাইতেন কিন্তু আবেগের আতিশয্যে উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি। কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার পর তিনি বলেন যে, আমি যখন বয়আত করেছি তখন আমার বেতন ছিল সাত রুপিয়া। আর সকলভাবে ব্যয় সংকোচন করে কিছু না কিছু পয়সা সাশ্রয় করতাম যেন স্বয়ং কাদিয়ান গিয়ে হুযূরের সকাশে পেশ করতে পারি আর রাস্তার একটা বড় অংশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতাম যেন নূন্যতম খরচ করে কাদিয়ান পৌঁছতে পারি। এরপর আমার পদোন্নতি হয় আর একই সাথে দেয়ার এই লিপ্সাও বাড়তে থাকে। আর হুযূরের সামনে স্বর্ণ উপহার দেয়ার বাসনা জাগে সামান্য বেতন থেকে চাঁদা দেয়ার পর যা আমি অতিরিক্ত দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু অল্প অল্প করে কিছু জমা করার পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতাম যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি অনেক দিন হয়ে গেছে তাই স্বর্ণ হস্তগত করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা জমা হওয়ার পূর্বেই কাদিয়ান চলে আসতাম আর যা কাছে থাকত হুযূরের সমীপে উপস্থাপন করতাম। অবশেষে এই তিন পাউন্ড একত্রিত করেছিলাম ইচ্ছা ছিল যে, স্বয়ং উপস্থিত হয়ে হুযূরের সকাশে উপস্থাপন করব কিন্তু এরই মাঝে হুযূর ইহধাম ত্যাগ করেন। এক কথায় তার ত্রিশটি বছর এই আক্ষেপের মাঝে কেটে যায়। এর জন্য পরিশ্রমও করেছেন কিন্তু যখন তৌফিক হয়েছে ততদিনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইহজীবনের সমাপ্তি ঘটে। তোএই ছিল তাদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর ত্যাগের প্রেরণা।

নামাযের পর এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের জানাযা। তিনি কাদিয়ানের দরবেশ। ২০১৫ সালের ২২শে জুলাই ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তার বংশে তিনি একমাত্র আহমদী ছিলেন। দীর্ঘদিন মাদ্রাসায়ে আহমদীয়ায় কুরআন এবং হাদীস পড়ানোর তার সৌভাগ্য হয়েছে। খুবই সাধাসিধে, বিনয়ী এবং দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে কাজ করতেন। বড় নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত একজন মানুষ ছিলেন। তিনি লাহোরের চুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন যা আজকাল কসুর জেলার অন্তর্গত। বাল্যকালে তিনি নিজ গ্রামেই শিক্ষা অর্জন করেছেন। এরপর ১৯৩৯ সালে লাহোরের একটি আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠান থেকে হাদীসের প্রারম্ভিক বই-পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়েছে। সেখানে এক আহমদীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় যার কাছ থেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে সত্যের গবেষণার জন্য বেশ কয়েকবার কাদিয়ান আসেন। বই-পুস্তক পড়তে থাকেন। অবশেষে

১৯৪৪ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে তার বয়াতের সৌভাগ্য লাভ হয়। এরপর ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য কাদিয়ানে স্থানান্তরিত হন। ১৯৪৭ সনের এপ্রিল মাসে মুবাল্লেগীন ক্লাসে ভর্তি হন। পড়ালেখা চলাকালে দেশ বিভাগ এবং কাদিয়ান থেকে হিজরতের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায় কাদিয়ানে বসবাস করাকে প্রাধান্য দেন এবং দরবেশীর জীবন বেছে নেন। ১৯৪৯ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর এই নির্দেশের অধীনে যে, কাদিয়ানে আলেমদের ঘাটতি পূরণের জন্য মুবাল্লিগ ক্লাস থেকে কতককে বাছাই করে উচ্চ শিক্ষা দেয়া উচিত, তাকেও নির্বাচন করা হয় যা চার বছর মেয়াদী ছিল। এই শিক্ষার সমাপ্তির পর ১৯৫৫ সনের মে মাসে তাকে কাদিয়ানে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫৮ সনে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। দীর্ঘদিন মাদ্রাসা আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে খিদমত করতে থাকেন। এরপর সিনিয়র শাহেদ গ্রেড নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু এরপরও দীর্ঘদিন তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। নামায এবং রোযার বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন, কর্মশক্তিতে বলিয়ান এক আলেম ছিলেন। শিষ্যদেরকে পিতার মত স্নেহ করতেন। বছরের পর বছর মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ছাত্রদেরকে হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন। হাদীসের গ্রন্থের অধ্যয়ন ছিল সুগভীর আর বর্ণনাও এত আকর্ষনীয় ছিল যে, ছেলেদের হৃদয়ে পাঠ গেঁথে যেত। আহমদীয়াতের ইতিহাসের একাদশতম খণ্ডে কাদিয়ানের দরবেশদের যে তালিকা ছেপেছে তাতে তার নাম্বার হল ১৫৩। বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও দরবেশীর দীর্ঘ যুগ তিনি পরম ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে কাটিয়েছেন। মূসী ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া পরিবারে তিন কন্যা, এক সৎ পুত্র এবং নিজের এক পুত্র রেখে গেছেন। অর্থাৎ তার এক সৎ পুত্র ছিল। তার পুত্র জনাব জামিল আহমদ নাসির সাহেব এডভোকেট, জামাতের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা এবং মূসীদের সম্পত্তির নাযেম তাশখিস। সৎ পুত্র জনাব বদর উদ্দিন মেহতাব সাহেব ফযলে ওমর প্রেসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন। তার কন্যা আয়েশা বেগম সাহেবা ডক্টর মসীহ্ আহমদ সাহেব হাফেযাবাদির স্ত্রী। এখন নুসরাত উইমেনস কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকে তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, 24th July 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO .....

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B